Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.192-201
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবিঠাকুরের গানের পাঠভেদে ‘গগন’ এবং ‘আকাশ’

ঋতুপর্ণা ঠাকুরা
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Lyricist Rabindranath wrote a new song in a frenzy to express himself, or used it after a new song in a play or composed only a song for a play. Sometimes poetry has been given a lyrical form, expanding the song into a form of poetry. A review of song manuscripts usually constructed in the structure of sthaayi, antara, sanchari and abhoga reveals a varied pattern of transposition. He was a relentless reviser. Basically the editing technique is behind the differences in the lyrics of his songs. If we observe the differences in the lyrics of his songs, the emotional swing of the poet is evident in the use of certain words. That is, using a word in a song, then cutting it out and choosing a synonym, but not satisfied with that, bringing back the original word. And in the final text of 'Gitabitan', sometimes the deleted text was compiled and sometimes the revised text. These repeated changes not only reveal the poet's emotional instability, but illuminate the poet's conscious vision to give the song a complete form, to keep its beauty intact. As we examine several manuscripts of Rabindranath's songs in the Rabindra Bhabana Archive, we witness the poet's dilemma over the use of the words 'Gagan' and 'Akash'.

ঠাকুর বাড়ির সাংগীতিক আবহে বড় হয়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের কাছে ছোটোবেলা থেকেই গান ছিল অন্যতম পছন্দের বিষয়। স্মৃতিচারণায় তিনি লিখেছেন-

> মনে আছে বাল্যকালে গাঁদাফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলার অনুকরণের আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না।[১]

গানের সঙ্গে তাঁর চিরকালই এক অচ্ছেদ্য বন্ধন পরিলক্ষিত হয়। ভিন্ন স্থানে ভিন্ন মুহূর্তে কবির লেখনিতে গানের অপরূপ চিত্র মূর্ত হতে দেখা যায়। ‘জীবনস্মৃতি’র পাতায় তাই কবি স্বীকার করেছেন-

> চিরকালই গানের সুর আমার মনে একটা অনির্বচনীয় আবেগ উপস্থিত করে। এখনো কাজকর্মের মাঝখানে হঠাৎ একটা গান শুনিলে আমার কাছে এক মুহূর্তেই সমস্ত সংসারের ভাবান্তর হইয়া যায়। এই সমস্ত চোখে-দেখার রাজ্য গানে-শোনার মধ্য দিয়া হঠাৎ একটা কী নূতন অর্থ লাভ করে।[২]

গীতিকার রবীন্দ্রনাথের জীবনের পাতা উল্টে দেখা যায় গান রচনায় স্রষ্টার কী বিপুল উৎসাহ এবং কী বিচিত্র ভঙ্গি। কখনো নিজের খেয়ালে সৃষ্টির উন্মাদনায় নতুন নতুন গান রচনা করেছেন, কখনোবা নতুন গান সৃষ্টির পর তা ব্যবহার করেছেন নাটকে অথবা শুধু নাটকের জন্যই গান রচনা করেছেন। আবার কখনো কবিতাকে ভেঙে গীতরূপ প্রদান করেছেন, কখনো গানকে বিস্তৃত করে কবিতার অবয়ব দিয়েছেন। আবার এও দেখা যায় সারিগান, ভাটিয়ালি, বাউল প্রভৃতি লোকগীতির সুরে অথবা হিন্দুস্থানী কোনো গানকে ভেঙে নতুন গান রচনার প্রয়াস। বিবিধ পন্থায় এই বিচিত্র গান রচনার ইতিহাস রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসু পাঠকের কম-বেশি সকলেরই জানা। কিন্তু গানের চূড়ান্ত রূপ দিতে গিয়ে কত বদল করেছেন কবি তা পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি পর্যবেক্ষণ না করলে বোঝার উপায় নেই। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য লিখেছেন-

> পাণ্ডুলিপির পাতায় তাঁর একটি গান কেমন করে ধীরে ধীরে সৃষ্টির মহিমা লাভ করেছিল, তা জানতে বড়ই কৌত,হল জাগে। তাঁর 'মনের মধ্যে যে গান বাজে' তা কি তাঁর পাণ্ডুলিপিতে অনায়াসে বাণীরূপ লাভ করে সংগীত হয়ে উঠেছিল? নাকি প্রতিটি গানের নির্মাণের পিছনে আছে গীতিকারের অনেক প্রযত্ন, অনেক শ্রম-প্রয়াস-সতর্কতা। একদিন তঁর গান শুনে বলেছি --'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী আমি অবাক হয়ে শুনি', কিন্তু এখন তাঁর গানের দুর্লভ সব পাণ্ডুলিপি একটি একটি করে দেখার পরম সৌভাগ্য লাভ করে গীতবিতানের স্রষ্টার উদ্দেশে বলতে ইচ্ছে করে- 'বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে'।[৩]

সাধারণত স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের কাঠামোয় নির্মিত গানের পাণ্ডুলিপিগুলি প্রত্যক্ষ করলে পাঠান্তরের বিচিত্র রূপরেখা পরিলক্ষিত হয়।

1) শব্দ বদল(নতুন শব্দ সংযোজন, বর্জন ও স্থানান্তর)
2) চরণ পরিবর্তন(অতিরিক্ত চরণ সংযোজন, বর্জন ও স্থানান্তর)
3) স্তবক সংশোধন(স্তবক সংযোজন, বিয়োজন ও স্থানান্তর)
4) ভাব ও ভাষায় বদল(ভাব এক রেখে ভাষায় ভিন্নতা অথবা ভাব ও ভাষায় উভয়ক্ষেত্রে বদল)

মূলত উক্ত সংশোধন কৌশল তাঁর গানের পাঠভেদগুলির পিছনে ক্রিয়াশীল। তাঁর গানের পাঠভেদগুলি অবলোকন করলে কোনো কোনো শব্দ ব্যবহারে কবির মানসিক দোলাচলতা স্পষ্ট। অর্থাৎ কোনো শব্দ গানে ব্যবহার করছেন, পরে তা কেটে দিয়ে সমার্থক শব্দ চয়ন করছেন, কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে পুনরায় আদি শব্দটিকে ফিরিয়ে আনছেন। আবার 'গীতবিতান'-এর চূড়ান্ত পাঠে হয়তো কখনো কেটে দেওয়া পাঠ সংকলিত হয়েছে তো কখনো সংশোধিত পাঠ। এই যে বারংবার মত বদল তা কবির মানসিক অস্থিরতাকে শুধু প্রকাশ করে না, গানটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে, তার সৌন্দর্য্যকে অটুট রাখতে কবির সচেতন দৃষ্টিকে

আলোকিত করে। আমরা রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে(Rabindra Bhabana Archive) রবীন্দ্রনাথের গানের বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে 'গগন' ও 'আকাশ' শব্দদুটির প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবির মানসিক দ্বিধা প্রত্যক্ষ করি। নীচে পর্যায়ক্রমে তা আলোচনা করা হল।

অনেক সময় রবীন্দ্রনাথ গানের মূল ভাবসংগতি বজায় রাখতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেছেন। ভাব ও ভাষার অব্যর্থ মেলবন্ধন না হওয়া পর্যন্ত কবির এই প্রয়াস ছিল নিরন্তর। সেদিক থেকে ৮ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির ১৩৯ পাতায় এবং ২৮ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির ৮১ পাতায় 'যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে'('পূজা' ৩৩৫) গানটির দুটি পাঠ পাচ্ছি এবং এ-দুটি পাঠই বৈচিত্র্যময়। এই গানের 'বাজায় ঊষা নিশীথকূলে যে গীতভাষা' চরণের 'নিশীথ' শব্দের পূর্বপাঠ ছিল 'গগন'। 'গগন' শব্দটির মধ্যে ব্যাপ্তি ছিল ঠিকই কিন্তু বর্তমানে ঊষা ও নিশীথের কালজ্ঞাপক ব্যাপ্তি অনেক ব্যঞ্জনাময়। আবার ঊষার 'গগনের কূলে'র বদলে 'নিশীথকূলে' 'গীতভাষা বাজানো'র আবহ বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনি তাৎপর্যবাহী। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আলো-আঁধারের সেতু: রবীন্দ্র-চিত্রকল্প' বইতে আলো-আঁধারের এই বৈপরীত্য সুচারু ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন-

> অন্ধকারকে দুই অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে- এক, ব্যক্তিগত অন্ধকার, ব্যক্তিগত অচরিতার্থতা; দুই, বিশুদ্ধ বেদনার উপমান, তাঁর বিপুল অন্ধকার আশ্রয়ের সান্ত¦নার উপমান।... রবীন্দ্র-সাহিত্যে নিশীথিনীর প্রতিমা গদ্যে একরকম, গানে তা আর-একরকম। গানে 'নিশীথিনী' বিরহের ভাবপ্রতিমা।[৪]

উল্লেখ্য যে, 'বাউল' উপপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত 'জানি জানি তোমার প্রেমে' গানটির ৮ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির সংশোধিত পাঠটি ২৮ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে স্থান পেয়েছে। 'মোর হৃদয়পাখির গগন তোমার হৃদয়দেশে' চরণের 'গগন' শব্দের আদিপাঠ উদ্ধার করা সম্ভব না হলেও, কাটা অংশের ওপরে তোলাপাঠ রূপে 'আকাশ' শব্দটি লক্ষণীয়। পরে এই শব্দটিও কেটে 'গগন' শব্দটি লেখা যা চূড়ান্ত পাঠ রূপে গৃহীত হয়েছে। 'আকাশ' ও 'গগন' একই শব্দের দুই ভিন্ন রূপ। রবীন্দ্রনাথের গানের পাঠান্তরের ইতিহাসে শব্দদুটি গ্রহণের ক্ষেত্রে কবিমনের দোলাচলতা লক্ষ করা যায়।

আষাঢ় ১৩১৬ বোলপুরে লেখা 'পূজা' পর্যায়ের ১২৯ সংখ্যক('কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো') গানটির একমাত্র পাণ্ডুলিপি পাঠ পাওয়া যায় ৩৫৮ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির ১৯-২০ পাতায় লাল কালিতে। এখানে প্রচুর সংশোধন পরিলক্ষিত হয়। তবে সংশোধিত পাঠ 'গীতবিতান' পাঠে সংকলিত হয়েছে। বর্জিত পাঠটি পাণ্ডুলিপির পাতায় থেকে গেছে চিরতরে। আদিপাঠের প্রথম অংশে 'আগুন দিয়ে' প্রাণের আলো জাগরণের বার্তা ছিল। কিন্তু সংশোধিত পাঠে আলোর অবস্থান নিয়েই সংশয়ের পাশাপাশি আগুনের রূপক হিসেবে 'বিরহ'কে চিহ্নিত করে গানটির ভাবার্থে দুঃখের সুর নিয়ে এসেছেন। বিরহানলে 'প্রেমের বাতি'/'প্রেমের

প্রদীপ' জ্বালানোর প্রসঙ্গ বারবার প্রকাশ করতে চেয়েও কেটে দিয়েছেন। আসলে কবি যেন প্রেমের প্রসঙ্গ আড়ালে রাখতে চেয়েছেন এখানে। কাটাকুটির মধ্যে অন্যতম হল 'আকাশ' কেটে 'গগন' শব্দটির গ্রহণ-

> ~~অশ্রুজল পড়ুক দরদরি আকাশ~~ ↑গগন↑ তল গিয়েছে মেঘে ভরি,
> ~~বৃষ্টি~~ ↑বাদল↑ জল পড়িছে ঝরিঝরি!

'অশ্রুজল পড়ুক দরদরি আকাশতল গিয়েছে মেঘে ভরি' চরণটি প্রথম আদিপাঠ হিসেবে লিখেও পরে সম্পূর্ণ অংশটি নতুনভাবে সাজান কবি- 'গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি/ বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি'। এখানে ধ্বনিমাধুর্যে 'গগনতল' স্বভাব-সুভগ পেলবতার কারণে কবিমনকে ছুঁয়ে গেছে নিবিড়ভাবে। তাই 'আকাশ' শব্দটির বদলে 'গগন' চূড়ান্ত পাঠের মর্যাদা পেয়েছে।

১০ ভাদ্র ১৩১৭ সালে লেখা 'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী'('পূজা' ৪ সংখ্যক) গানটি সংগীতজ্ঞ এনায়েৎ খাঁর সংবর্ধনা সভায় তাঁকে উদ্দেশ্য করে লিখিত। এ প্রসঙ্গে সমীর সেনগুপ্ত সমালোচক সুখরঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্র কথা-কাব্যের শিল্পসূত্র' গ্রন্থ থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে লিখেছেন-

> সভাপতির বক্তৃতার পর বেদীর ওপরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলে কবিকে ধরে বসলেন গাইবার জন্য। কবি আপত্তি জানালেন। সকলে জিদ করতে লাগলেন। কবির আপত্তি প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাহল, তিনি বললেন--শরীর ক্লান্ত, পূর্বের স্বরও আর নেই, তাছাড়া এই ওস্তাদের কাছে মুখ খুলতে আমি কিছুতেই রাজি নই। . . . শেষে গুরুদাস বলে ফেললেন--(বেদীর খুব নিকটেই বসেছিলুম বলে স্পষ্ট শুনলুম)-- 'আপনি ভালো গাইতে পারেন বলে অহঙ্কার আছে, সেই অহঙ্কারে পাছে কোনো দিক দিয়ে ঘা লাগে তাই গাইতে চাচ্ছেন না।' তখন রবীন্দ্রনাথ আর না গেয়ে পারলেন না। প্রথমে হারমোনিয়াম নিয়ে চেষ্টা করে পরে শুধু গলাতেই গাইলেন সেই বিখ্যাত গান-- 'কেমন করে গান কর হে'।. . . সেটি ছিল তখনো অপূর্ব-প্রকাশিত। কাজেই স্থান কাল পাত্র বিবেচনায় গানের অর্থ মিলিয়ে সকলে ধরে নিলেন গুণী এনায়েৎ খাঁ-কে উদ্দেশ করেই সেই গান তখনি মুখে মুখে রচিত হয়েছিল।[৫]

গানটির প্রথম অংশের 'হে'র বদলে পাণ্ডুলিপি পাঠে 'যে' পরিলক্ষিত হয়। 'সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে' চরণটি লিখে 'ভুবন' ও 'ফেলে' শব্দের মধ্যে বদল চিহ্ন দিয়ে পুনরায় কেটে দেওয়া। 'সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে' চরণের 'গগন' শব্দটি '~~আকাশ~~' লিখে কেটে পাশে লেখা। সংশোধিত পাঠ 'গীতবিতান'-এ গৃহীত হয়েছে। এখানে দেখা যায় পূর্ববর্তী চরণের 'ভুবন' শব্দটির সঙ্গে সুর সামঞ্জস্যে 'গগন' শব্দটির মিল থাকায় 'আকাশ' শব্দটি বর্জন করেছেন কবি।

'জননী, তোমার করুণ চরণখানি' গানের ক্ষেত্রেও একই সংশোধন চোখে পড়ে। 'পূজা' পর্যায়ের (৪৬৪ সংখ্যক) অন্তর্গত 'বিবিধ' উপপর্যায়ের 'জননী, তোমার করুণ চরণখানি' গানটির পাণ্ডুলিপি পাঠটি কাটাকুটিতে

ভরা। কিন্তু পাতাটি ছেঁড়ার কারণে শেষ তিন চরণ উদ্ধার করা যায় না। আমাদের যেহেতু পাণ্ডুলিপির বৈদ্যুতিন প্রতিলিপির উপর নির্ভর করতে হয়েছে, তাই যা পাওয়া গেছে তাই আমাদের সম্বল। ছেঁড়া পাতার হদিশ পেলে সম্পূর্ণ পাঠ পাওয়া যেত। পাণ্ডুলিপি পাঠে দেখা যায় গানের প্রথম চরণ 'জননী তোমার চরণ কমলখানি' লিখে 'কমল' শব্দটি কেটে 'চরণ' শব্দের পূর্বে ∧ চিহ্ন দিয়ে ওপরে লেখা 'করুণ'। সংশোধিত নব রূপটি 'গীতবিতান' পাঠে গৃহীত হয়। পূর্বপাঠে জননীর চরণকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল যার মধ্যে স্বর্গের দেবীর পাদপদ্ম আভাসিত। কিন্তু সংশোধিত পাঠে চরণের বিশেষণরূপে 'করুণ' শব্দটি প্রয়োগ করায় জননী, দেবী থেকে মানবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানেই আধুনিক এবং একইসঙ্গে রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। অর্থাৎ পূজার গান শুধু আধ্যাত্মিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না থেকে মানবলোকের অনুভ,তির সঙ্গে অঙ্গীভ,ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে,- তা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়নি। অরুণকুমার বসু তাই লিখেছেন-

> অসাম্প্রদায়িক মাতৃচেতনাই রবীন্দ্রনাথের 'জননী তোমার করুণ চরণখানি' এবং 'তিমিরদুয়ার খোলো' গানগুলিতে কৃতার্থ হয়েছে।[৬]

গানটির 'নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে' চরণের ক্ষেত্রে প্রথমে 'নীরব আকাশে ভরি উঠে চুপে চুপে' লিখে ~~'আকাশে'~~ শব্দটি কেটে তোলাপাঠে লেখা 'গগনে' যা গীতবিতান পাঠে সংকলিত হয়েছে। 'আকাশে' শব্দটি বর্জিত হয়ে 'গগনে' শব্দটিই এখানে গৃহীত হয়েছে।

'যদি আমায় তুমি বাঁচাও তবে' (পূজা ৮০ সংখ্যক) গানে অবশ্য শেষ পর্যন্ত 'গগন' বর্জিত হয়ে 'আকাশ' শব্দটি চূড়ান্ত পাঠের মর্যাদা পেয়েছে। গানটির পাণ্ডুলিপি পাঠ কাটাকুটিতে ভরা।–

যদি আমায় ~~যদি~~ ↑তুমি↑ বাঁচাও, তবে
তোমার নিখিল ভুবন ধন্য হবে।
(যদি) ↑আমার↑ মলিন মনের কালী
মুছাও পুণ্য সলিল ঢালি
তোমার চন্দ্র সূর্য্য নূতন আলোয়
জাগ্বে জ্যোতির মহোৎসবে।
~~আমার শোভা আমার গন্ধ~~ আজো ফোটেনি মোর শোভার কুঁড়ি;
~~কঠিন বাধায় আছে ঢাকা।~~ তারি বিষাদ আছে জগৎ জুড়ি।
~~তাই জগতের কুঞ্জবনে~~
~~বাতাস বহে বিষাদ মাখা।~~
যদি নিশার তিমির গিয়ে টুটে

~~হৃদি~~ ↑আমার↑ হৃদয় জেগে উঠে-
তবে মুখর হবে সকল ~~আকাশ গগন~~ আকাশ
আনন্দময় গানের রবে।

সংশোধিত পাঠ অনেকাংশে 'গীতবিতান' পাঠে স্থান পেয়েছে। কেবল 'যদি আমার মলিন মনের কালী/ মুছাও পুণ্য সলিল ঢালি' অংশের 'মলিন মনের' স্থান বদলে 'মনের মলিন' রূপে এবং 'মুছাও' শব্দের পরিবর্তে 'ঘুচাও' সংকলিত হয়েছে। যেহেতু 'যদি' অতিপর্ব কিছু লিখে তার উপর কালি বুলিয়ে লেখা অর্থাৎ আদিপাঠ উদ্ধার করা যায়নি তাই সংশোধনের কারণটি অস্পষ্ট থেকে গেছে। তবে এখানেও আকাশ ও গগন শব্দ দুটির প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবির দোলাচলতা প্রত্যক্ষ করা যায়। গানের শেষ চরণে আদিপাঠরূপে প্রথমে '~~আকাশ~~' লিখে তা কেটে দিয়ে পাশে লেখা 'গগন'। কিন্তু পরে '~~গগন~~' কেটে দিয়ে তার পাশে পুনরায় লেখা 'আকাশ'। 'গীতবিতান' পাঠে এটি সংকলিত হয়েছে।

'পূজা'('বন্ধু' উপপর্যায়) পর্যায়ের অন্তর্গত 'আমার মাঝে তোমারি মায়া' গানটি পৌষ ১৩৩৬ সালে রচিত। গানটির ৮ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি পাঠটি কাটাকুটিতে ভরা। কাটাকুটির ভিতর থেকে প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে ২৮ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে ভিন্ন একটি পাঠ লক্ষ করা যায়। পাঠটির কিছুটা অংশ এরকম-

আঁকিছ মোর ~~জীবন~~ ↓মেঘের↓ পটে তব ~~মানস~~ ↓রঙের↓ ছবি
~~আকাশে মোর~~ আছ আপন মহিমা লয়ে মোর গগনে
~~আমার মাঝে~~ ∧ ~~তোমারি মায়া জাগালে তুমি রবি~~ ↓~~কবি~~↓,
~~আপন মনে আমার পটে আঁক মানস ছবি।~~
তাপস তুমি ধেয়ানে তব
কী দেখ মোরে কেমনে কব
~~আপন রঙে মেঘ স্বপন আপনি রচো রবি।~~ ↑ভাবনা করো↑
তোমার জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী।

উপর্যুক্ত অংশটি দেখে বোঝা যায় 'গীতবিতান'-এর 'আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি/ আপন মনে আমারি পটে আঁকো মানস ছবি' গানের প্রথম দু-কলি রবীন্দ্রনাথ সংশোধন করেছিলেন। আপন খেয়ালে 'আমার পটে' 'মানস ছবি' আঁকার বিষয়টি স্পষ্ট করে বলে দিয়েও পরে 'মোর জীবন পটে' বলে আরো বিশদে ব্যক্ত করেন কবি। পরে তাও সংশোধন করে 'মেঘের পটে' 'রঙের ছবি' আঁকার কথা বলে ভিন্ন ব্যঞ্জনায় তা উপস্থাপিত করেছেন কবি। কিন্তু সংশোধিত পাঠের বদলে বর্জিত পাঠই প্রচলিত 'গীতবিতান'-এ সংকলিত হয়েছে। প্রথম চরণটিতে বর্তমান পাঠ কেটে প্রথমে তিনি লিখেছিলেন 'আকাশে মোর আছ আপন মহিমা লয়ে'। পরে '~~আকাশে মোর~~' অংশটুকু কেটে চরণের শেষে 'মোর গগনে' শব্দবন্ধটি সংযোজন করে

চরণটির নতুন রূপ দেন 'আছ আপন মহিমা লয়ে মোর গগনে'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই নতুন সংশোধিত রূপটিও বর্জন করে প্রথম পাঠটিকেই চূড়ান্ত পাঠের মর্যাদা দেন। অর্থাৎ বর্জিত 'আকাশে' বা সংশেধিত 'গগনে' কোনোটিই 'গীতবিতান'-এ স্থান পায়নি। কবিসত্তা এবং কবির-উদ্দিষ্ট মানস সত্তার দ্বিরালাপ এখানে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা চেতনার কথা মনে করিয়ে দেয়। মনে পড়ে রবীন্দ্র-মননে 'কবির অন্তরে তুমি কবি'- চেতনার সক্রিয় প্রণোদনার কথা। বিশেষ করে 'আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি' চরণের 'কবি' শব্দের স্থলে 'রবি' শব্দটির বর্জন এই ভাবটিকেই প্রকট করে। কিন্তু মজার বিষয় হল উক্ত সংশোধিত পাঠটি কবি একেবারে বর্জন না করে শ্রাবণ ১৩৩৯ সালে একটি নতুন গানের জন্ম দেন। গানটি 'বিশ্ব' উপপর্যায়ে('পূজা' ৩৩৮) স্থান পায়। গানটির প্রথমাংশ এরূপ-

আছ আপন মহিমা লয়ে মোর গগনে রবি,
আঁকিছ মোর মেঘের পটে তব রঙেরই ছবি।।
তাপস, তুমি ধেয়ানে তব কী দেখ মোরে কেমনে কব-
তোমার জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী।।

অর্থাৎ 'আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি'('পূজা' ৭১) গানটির বর্জিত পাঠ এখানে সংকলিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিকৃত সংশোধনটি দেখলে বোঝা যায় যে 'বন্ধু' উপপর্যায়ের এই গান থেকেই পরে সংশোধন করে 'বিশ্ব' উপপর্যায়ের উক্ত গানটির সৃষ্টি। পরে রচিত গানটিতে 'রবি'র মহিমা ব্যক্ত হয়েছে মেঘের পটে রঙীন ছবি অঙ্কনের মধ্য দিয়ে। তাই অবধারিতভাবেই 'গগন' শব্দটির উপস্থিতি এখানে লক্ষণীয়। কিন্তু আগের গানে 'রবি'র বদলে 'কবি' স্থান পাওয়ায় তার পটভূমি 'গগনে'র অনুপস্থিতি যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। দুটির গানের তুলনা করলে দেখা যায় আলোচ্য গানের শেষ চরণ 'মুকুল মম সুবাসে তব গোপনে সৌরভী' চরণটি বাদে বাকি অংশের ভাব ও ভাষা অভিন্ন।

'পূজা'র 'আনন্দ' উপপর্যায়ের গান 'আলোয় আলোকময় কর হে' ২০ অগ্রহায়ণ ১৩১৬ সালে রচিত। ৪২৭(i) সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে গানটির একটি বিকল্প পাঠ পরিলক্ষিত হয়। যদিও পাঠটি কাটাকুটিতে পূর্ণ থাকার দরুণ সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পাঠটি নিম্নরূপ-

~~আলোয় x x তোমারে(x) †আলোকময় কর হে x†~~
~~X আমায় কর হে x x~~
~~নয়ন হতে আঁধার আজি~~
~~মিলালো মিলালো~~
~~আকাশে x ভরল x x~~
~~আনন্দে যে গগন ভরা আনন্দ এ বসুন্ধরা~~

~~যে দিক x ছেয়ে x ভালোর x~~
~~ভুবন পানে নয়ন মেলি সকলি x হেরি ভালো~~
~~বনের মাঝে নদীর তীরে প্রভাত ↑আলোর↑ কহে কথা~~
~~প্রভাত ↑আলোয়↑ আনে পাখীর নীড়ে আনন্দ বারতা~~
~~প্রভাত ↑ x x ↑আসে আমার ঘরে সকলকেই পরশ করে~~
~~X মাঝে পুণ্য কর বুলালো বুলালো।~~
~~X x x x x~~
~~X তোলে প্রাণ~~
~~X x x তোমার x~~
~~জাগিয়ে তোলে গান~~
~~X আকাশ x x~~
~~X x x~~

৪২৭(ii) ও ৪৭৮ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি পাঠে কিছু সংশোধিত পাঠ এবং কিছু নূতনত্বের মিশেল পরিলক্ষিত হয়-

আলোয় আলোকময় কর হে
এলে আলোর আলো-
আমার নয়ন হতে আঁধার ~~যবে~~
মিলালো মিলালো।
সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দে হাসিতে ভরা,
যেদিক পানে নয়ন মেলি
ভালো সবি ভালো।
তোমার আলো গাছের পাতায়
নাচিয়ে তোলে প্রাণ।
তোমার আলো পাখীর বাসায়
জাগিয়ে তোলে গান।
তোমার আলো ভালবেসে
পড়েছে মোর গায়ে এসে,
~~তোমার~~ হৃদয়ে মোর নির্ম্মূল হাত
বুলালো বুলালো।

এই সংশোধিত পাঠ 'গীতবিতান'-এ সংকলিত হয়েছে। ভাবের খুব বেশি ফারাক চোখে পড়ে না, কেবল ভাষার নতুন কারুকার্য দর্শণীয়। তবে এখানে একবার '~~আকাশ~~' লিখে কেটে দিয়ে পরে আবার '~~গগন~~' শব্দটিও লিখে কেটে দেওয়া। গানের শেষাংশে পুনরায় 'আকাশ' শব্দটির উপস্থিতি চোখে পড়ে। তবে শেষ পর্যন্ত তাও কেটে দেওয়া। যদিও চূড়ান্ত পাঠে 'আকাশ' শব্দটি গৃহীত হয়েছে।

শ্রাবণ ১৩৩৯ সালে রচিত 'বিচিত্র' পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য গান হল 'দেখা না- দেখায় মেশা'। গানটির দুটি পাণ্ডুলিপি পাঠ পাওয়া যায় ৪৬৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির ৪১ পাতায় এবং ১৬৫ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির ১৪ পাতায়। ৪৬৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি পাঠটি ঘন কালির কাটাকুটিতে পূর্ণ থাকায় আদিপাঠ সম্পূর্ণ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পাঠটি নিম্নরূপ-

দেখা না দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা
কাঁপাও ঝড়ের ~~x~~ ↑বুকে↑ এ কী ব্যাকুলতা।
~~X x~~ ↑গগনে সে↑ ~~আকাশে আকাশে x~~
~~X সে খোঁজে x~~ ↓~~খোঁজে কাছে খোঁজে দূরে~~↓ ←ঘুরে ঘুরে খোঁজে কাছে খোঁজে দূরে
~~ডাকে তারে x x~~
~~উঠিল হেসে কহি x কথা~~ ↑সহসা কি হাসি হাস নাহি কহ কথা↑
~~X x x~~
~~X x x x x~~
~~X x x x x~~
আঁধার ঘনায় ~~x~~ ↑শূন্যে↑ নাহি জানে নাম
কী রুদ্র সন্ধানে সিন্ধু দুলিছে দুর্দাম।
অরণ্য হতাশপ্রাণে আকাশে ললাট হানে,
দিকে দিকে কেঁদে ফেরে কি দুঃসহ ব্যথা!

সংশোধিত পাঠ ১৬৫ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি পাঠে ও 'গীতবিতান'-এ স্থান পেয়েছে। এই গানের সংশোধনের ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ করি যে '~~আকাশে আকাশে x~~' প্রথম লিখে পরে কেটে দিয়ে 'গগনে সে' লেখা। যদিও এক্ষেত্রে 'আকাশে' শব্দটি সম্পূর্ণ বর্জিত হয়নি। গানের পরবর্তী অংশে বা বলা ভালো আভোগ অংশে উক্ত শব্দটি('অরণ্য হতাশপ্রাণে আকাশে ললাট হানে') পুনরায় উপস্থিত।

'গগন' ও 'আকাশ' একই অর্থের দুই রূপ। দুটিই দু -অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ। কিন্তু শব্দদুটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবির মানসিক দোলাচলতা বারবার চোখে পড়ে। উক্ত গানের পাঠভেদগুলি থেকে জানা যায় যে 'গগন' বনাম 'আকাশ'-এর কাটাকুটির খেলায় বেশিরভাগ সময় 'গগন'ই জয়ী হয়েছে। এর নেপথ্য কারণরূপে যদি ধরে নিই উক্ত শব্দই কবির কাছে অধিক পছন্দের(কারণ যতক্ষণ না গানের কথা ও সুর কবির মনকে স্পর্শ করত

ততক্ষণ তিনি সংশোধন করে যেতেন)। তবে 'গীতবিতান'-এর পাতায় 'আকাশ' শব্দ দিয়ে কবির উল্লেখযোগ্য যেসব গানের কথা স্মরণে আসে সেগুলি হল- 'আকাশ ভরা সূর্য তারা', 'আকাশ হতে আকাশপথে', 'আকাশ হতে খসল তারা', 'আকাশে আজ কোন চরণের', 'আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি', 'আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায়', 'আকাশ তোমার কোন রূপে মন চিনতে পারে', 'আকাশ-তলে দলে দলে', 'আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে', 'আকাশ আমায় ভরল আলোয়' প্রভৃতি। সেই তুলনায় 'গগন' দিয়ে সূচনা যুক্ত গান কমই চোখে পড়ে('গগনে গগনে আপনার মনে', 'গগনে গগনে ধায় হাঁকি', 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে' প্রভৃতি)। তবে গানের ভিতরে 'আকাশ' ও 'গগন'-এর উপস্থিতির পরিসংখ্যান থাকলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হত। আসলে সংশোধনের ক্ষেত্রে কবির অপরিতৃপ্ত মনই এখানে কার্যকর। তাই বলা যেতে পারে-

> . . . পাঠান্তর আসলে শিল্পের ক্রমবিকাশের সাধনা। শিল্পী পূর্ণতার একনিষ্ঠ সাধক। কোনো রচনার রূপান্তর তিনি যখনই করেন তখনই বুঝতে হবে প্রথম রূপটিতে এমন কোনো অপূর্ণতা আছে যার ফলে লিল্পীর মনে সেই মুহূর্তের সুরটি বাজছেনা। তাঁকে তাই কেবলই পরিবর্তন করতে হচ্ছে কারণ তিনি বৈচিত্র্যের সন্ধানী।[৭]

বলাই বাহুল্য এই বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যই গীতিকার রবীন্দ্রনাথ গানের কথায় 'গগন' অথবা 'আকাশ'কে চয়ন করেছেন কোথাও কোথাও। তবে গানের কথার সাজুয্য ও সুরসাম্যতাও তার অন্তরালে নিহিত রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১.জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস, কলকাতা, ১৩১৯, পৃষ্ঠা ২৮

২.জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস, কলকাতা, ১৩১৯, পৃষ্ঠা ২৯

৩.রবীন্দ্রনাথের গানের পাণ্ডুলিপি, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, মুদ্রা ১৪২৮, নবপর্যায়, চতুর্থ বর্ষ, পৃষ্ঠা ৪১

৪.আলো-আঁধারের সেতু: রবীন্দ্র-চিত্রকল্প, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা ১১৭

৫.গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ, সমীর সেনগুপ্ত, প্যাপিরাস, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, মার্চ ২০১৩, পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬

৬. বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত, অরুণকুমার বসু, দে'জ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১০, পৃষ্ঠা ১৪৪

৭. রবীন্দ্রনাথের অন্তিমপর্বের সাহিত্য পাঠান্তর সমীক্ষা, জয়শ্রী মুখার্জী, অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা ৩২৩